মাতৃভাষা নিয়ে ভাসাভাসা কথা

নীতীশ বিশ্বাস

ভূমিকাঃ গুজরাটের আগুনে পুড়ছি আমরা। বিধ্বস্ত হচ্ছি বিশ্বায়নের বিপদ পাতে। ধ্বংস হচ্ছি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে। নিশ্চিহ্ন হচ্ছি নৈতিকতা মানবিকতা আর মূল্যবোধের অভিধানের তাপ থেকে। তবু বেঁচে আছি। যেন সেই বিন্দুর মতো। যার অবস্থান আছে আকৃতি নেই। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থানে থেকেও আমরা ভাষার কথা ভাবছি। যা হয়তো কিছু দিন পর বিলাস বলে মনে হবে। তবুও ভয়ংকর দিনের আশংকা বুকে করেই কিছু কথা। কিছু ব্যথা। এবং ভাষ াপ্রশ্নে এ অন্তর্জলি যাত্রা।

আত্মসমালোচনার পথ ধরে ঃ

পৃথিবীর ভাষা মানচিত্রে বাঙলার স্থান চতুর্থ। রাষ্টভাষা হিসেবে বাঙলাদেশের সূত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জে আজ তার স্থান জুটেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছে আন্তর্জাতিক ম াতৃভাষা দিবস। এসব অগ্রগমনের কাহিনী স্মরণে রেখেও ভারতে বাংলা ভাষায় ভাটার টান। অযুত তার সমস্যা একথা অস্বীকার করার সাধ্য কার? এর পেছনে বড় দায় বাঙালির। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাষাপ্রশ্নে উদারতা নামক উদরাময় রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ফলে ভারতের স্বাধীনতা সমকালে জন মানুষের কথা বলার, জনসংখ্যায় যে ভাষার প্রথম স্থান ছিল আর শ্রেষ্ঠভাষা ছিল সাহিত্য গুণে - সেই ভাষা ভারতে আজ সবচেয়ে অবহেলিত ভাষার একটি। এর প্রধান কারণ বাঙালি বুদ্ধিজীবী পন্ডিতেরা বাঙলা ভাষার অধিকার ও প্রাধান্যের কথা বলতে পারেনি, এক ধরনের অতি উদার হবার আত্মগরিমায়। তাই দেশ স্বাধীন হবার পরেও অফিসিয়াল ভাষা নিধারণের জন্য ভাষা কমিটির যে ভোটটি প্রয়োজন ছিল তাতেও এক বাঙালি মনীষী হিন্দির পক্ষেই ভোট দেন। যা বাঙলাকে দুয়োরাণী করে তুলতে মুখ্যভূমিকা পালন করেছে।

আর ব্রিটিশ শাসন অথবা মুসলিম শাসনের সময় দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি সরকারি প্রশাসনের প্রসাদ পাবার জন্য আগে শিখেছে ফারসি, পরে মেনে নিয়েছে ইংরেজিকে। তবে মোঘল যুগে বাঙলার যে সাহিত্যিক প্রসার, ইংরেজ আমলে যে সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ভারতে তৈরি করতে পেরেছিল, তা স্বাধীনতার পরে ঘরের শত্রুদের চক্রান্তে খর্ব হয়ে গেছে এবং আজও আক্রান্ত হয়ে চলেছে। এ সত্য-তথ্য কেবল বাঙলা ভাষার জন্য নয়; একথা সত্য অন্যান্য ভারতীয় বিশিষ্ট অহিন্দি ভাষ াগুলির ক্ষেত্রেও। যা সংবিধানের ভাষা নীতিকে অপব্যাখ্যা করে অহিন্দি ভারতীয় ভাষা গুলির অধিকার খর্ব থেকে খর্বতর করে তুলেছে। তাই ভাষাগত কেন্দ্রীয় অনুদানের ৮০ শতাংশ হিন্দী ভাষার জন্য। এ এক গভীর চক্রান্ত। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পুরস্কার, অনুদান, স্বীকৃতি দান - ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হিন্দির মাৎসন্যায় সারা দেশে চা পিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সর্বক্ষেত্রে সরকারি আধাসরকারি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হিন্দিকে 'রাজভাষা' রূপে রাজতান্ত্রিক পথে, অন্য ভাষাকে মাড়িয়ে, বাড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এই দলন, নির্যাতন আর সাংবিধানিক অবিচার সবচেয়ে সহনশীল সম্প্রদায় বাঙালিকে ও আজ প্রতিবাদে মুখর হতে বাধ্য করছে। তাই কলকাতা এই দশকে মাতৃভাষা প্রশ্নে একটু নড়ে চড়ে বসছে। যার নেতৃত্ব দিতে আজকাল, সংবাদ প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'ঐকতান গবেষণা পত্র' ১৯৯৩ - ৯৫ এ দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে মাতৃভাষার প্রশ্নটিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সামনে তুলে ধরে। এখন বিভিন্ন ভাষা সমিতি, নবজাগরণ, সহমর্মী সহ বিভিন্ন সংস্থা বাঙলা ও বাঙালির অধিকার নিয়ে সোচার হচ্ছেন। ১৯৯৫ সালে এ জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভ াষা সমিতি গড়ে ওঠে। আর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সহায়তায় পৃথিবীর বিরল দৃষ্টান্ত লিটল ম্যাগাজিন মেলা ১৯৯৮ থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে অর্ধ সহস্রাধিক ক্ষুদ্র পত্রিকার কণ্ঠে আজ মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সহস্র বেদনার মধ্যে এ এক শুভ বার্তা, শুভ প্রচেষ্টা।

ভাষা নিয়ে ভিন্ন ভাবনা ঃ

ভাষা প্রগতির ক্ষেত্রে কেবল যে উত্তর পশ্চিম ভারতের শাসক শ্রেণীর ষড়যন্ত্র বাঙলাকে (সুভাষ বসু থেকে জ্যোতি বসুর পশ্চিমবঙ্গকে) আর বাঙলা ভাষাকে অ াক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু করেছে তাই নয়- আমাদের বাঙলা ভাষীদের মধ্যেও আছে এক ধরনের আত্মপ্রতারণা। বর্ণবাদী মানসিকতা তার মধ্যে একটি প্রধান অন্তরায়।

এই সব উচ্চবর্ণের (সকলে নয়) আত্মপ্রবঞ্চকেরা আজও তাদের রক্তে প্রবাহিত ইংরেজ দালালি- কংগ্রেস এর প্রতি বংশবদ মানসিকতা - কেন্দ্রীয় সরকারি আমল াদের তুষ্ট করে নিজেদের ব্যক্তিগত আখের গোছানো ইত্যাদি অবস্থান নিয়েছে। আর এই অবস্থানের জন্য স্বাধীন ভারতে ওড়িশা, আসাম সব অন্যান্য রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা যে স্ট্যান্ড (অবস্থান) নিয়েছে - যতটুকু মাতৃভাষা প্রেম দেখাতে সক্ষম হয়েছে, আমাদের কলকাতার অতি বুদ্ধিজীবীরা তা কখনোই দেখাতে পারেনি। 'বাণী নিকেতন' এই সব তঞ্চক বুদ্ধিজীবীরা দিল্লীতে গিয়ে বাঙলার অধিকার সম্পর্কে 'না কথা -বলার' ভদ্রতা দেখিয়ে ছোট বড়-সুবিধা-নিজের লোকের দু'একটা পুরস্কার জোটানোর কাজ হাসিল করেছে।

ওড়িশার স্বনামধন্য নাট্যকার মনোরঞ্জন দাসের সঙ্গে কথা বলার সময় পূর্বাঞ্চলের অধিকার প্রশ্নে আসাম-ওড়িশা-বাঙলার ঐক্যের প্রশ্ন এলে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের এসব ভূমিকার কথা বলে তিনি দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে এদের স্বপ্ন ছিল যে, 'আমার ঘরের ছেলে মেয়েরা তো ইংরেজি ভালো জানে, আর আমার যা প্রতিপত্তি তাতে ছেলেমেয়ে ভাগ্নে ভাগ্নীর ব্যবস্থা করে নেব। যাহোক, অন্যদের হোক'- এই আত্মসর্বস্ব চিন্তা তৎকালীন ক্ষমতাপন্ন কংগ্রেস সহযোগী বুদ্ধিজীবীরা বাঙলা ভাষাকে দিনে দিনে প্রশাসন আর প্রয়োগ ক্ষেত্র থেকে লঘ থেকে লঘুতর করে তুলেছে। বামপন্থীরা তার বিরোধিতার নামে ইংরেজি বাঁচাও কমিটি করে আন্দোলনে নেমেছে। আমরা মাতৃভাষার জন্য যে পবিত্র ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন) মাসকে প্রতিবাদের কাল হিসেবে গ্রহণ করেছি সাম্রাজ্যবাদীদের এই সাংস্কৃতিক এজেন্টরা সেই মাসকেই ব্যবহার করছে ইরেজি বাঁচানোর নির্লজ্জ আন্দোলনের আয়োজন করে। এই আগমার্কা বিপ্লবীরা আবার বাঙলার ঐতিহ্যের কথা বলে! তারা আসলে বলে বাঙলার উপনিবেশিক মানসিকতার ঐতিহ্যের (?) কথা।

আর এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের (বাম ডান উভয়) অধিকাংশ বর্ণ হিন্দু। তারা এখনো গেঞ্জির তলায় ময়লা পৈতে বহন করে বিপ্লবীয়ানা করে চলে। কিন্তু অন্তরের অভ্যন্তরে থেকে যায় তাদের সামন্ততান্ত্রিক দুর্বলতা। তাই তারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, আর পারলৌকিক কাজে কখন যেন প্রগতির মুখোশ খুলে তিলককাটা মুখ বের করে ফেলে। বাঙলার প্রয়োগের প্রশ্নে ইংরেজি হিন্দির তাঁবেদারি করার প্রশ্নে- এদের এই দু'মুখো নীতিই বামফ্রন্টের যথার্থ মাতৃভাষা নীতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগে ব্যর্থ করে দিল।

এরা তাই আজও পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে বাঙলার ব্যবহারের ভিতরে বাইরে বাধা সৃষ্টি করে-যাতে দলিত দরিদ্র ঘরের মেধাবি সন্তানেরাও তার ইংরেজি স্কুলে পড়া অপগন্ড সন্তানের সঙ্গে একত্রে প্রতিযোগিতায় বসতেই না পারে। এ আর এক ধরনের অস্পৃশ্যতা। যা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর উন্নত সভ্যতার স্থান থেকে অশিক্ষিততম দেশে পরিণত করেছে- দারিদ্রের সহস্র বোঝার জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছে। আর বাঙলার প্রগতি চেতনার অভ্যন্তরে জমে থাকা এই সামন্ততান্ত্রিক বিষ আমাদের রাজনৈতিক প্রগতিশীল মানবিক গণতান্ত্রিক কর্মসূচীগুলিকে ভেতরে থেকে ধবংস ও পরাজিত করে দিচ্ছে।

তাই হীরেন মুখার্জীর মতো বুদ্ধিজীবীকে বলতে হয়-'এ কিসের কবি সম্মেলন যেখানে একজন দলিত কবির স্থান নেই?' বলতে হয়, বিভিন্ন আকাদেমি আর সরকারি সংস্থায় পর্যন্ত সমাজের ৮৫ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব এক শতাংশও নেই কেন?' - কে এ কথার উত্তর দেবে? একথার উত্তর দিতে হলে গদির তুলো পাতলা হয়ে যাবে- আমার ও ক্ষমতার বৃত্ত ছোট হয়ে আসবে। তাই .....

আর এজন্যই দিল্লীকা লাড্ডু পেতে যারা আগ্রহী তারা একঘর লোকের মধ্যে একজন দিল্লীওয়ালাকে তুষ্ট করতে ইংরেজি আর হিন্দি পাঞ্চ করে এক তোষামুদী ভাষার শী মুদি'দের তুষ্ট করতে ব্যস্ত। তারা বাঙলা থিয়েটার আন্দোলন, সঙ্গীত আন্দালনের মাথায় তাই বসায় হিন্দি-ইংরেজী চর্চাকারী হিন্দি-ইংরেজী চর্চকারী নাট্য ও সঙ্গীত দলগুলিকে। এখন দিল্লী থেকে বাঙলার জন্য বরাদ্দ টাকাও তাঁরা পান। পত্র-পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রেও তাই হয় এবং হবে। বাঙালি 'কাঙালির মায়ের' মতো আকাশে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে দেখছে-তার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু এজন্য দায়ী তাদেরই চরিত্রহীন, জাতীয় চরিত্রহীন, ব্যক্তি স্বার্থপর প্রতিভাবানেরা। এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার।

সরকারি কোনো কমিটি কেবল নয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে আজও এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব বাঙালি সমাজকে অনৈক্য আর স্বার্থপরতার চোরাবালিতে আটকে দিচ্ছে। তার গতি মন্থর হচ্ছে, তার শক্তি কমে আসছে। এ এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা।

বাঙলার বাহিরে বাঙালি ঃ

দেশ পত্রিকার মতো বড় পত্রিকা যার বাজার বাঙলার বাহিরে শিক্ষিত বাঙলিদের মধে একচ্ছত্র ছিল-তা আজ ভয়ানক ভাবে শুকিয়ে গেছে। দশ বছর আগে যে সব বাঙালি প্রবাসী পরিবার দুটি বাঙলা দৈনিক, একটি দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক ছিল- তারা আজ একটিও বাঙলা মাসিক পত্রিকা রাখেন না। ইংরেজি হিন্দি পত্র-পত্রিকা, চটুল ম্যাগাজিন সেই সুস্থ সুন্দর চির বাগানে নষ্ট কীটের মতো ঢুকে পড়েছে।

বাড়িতেও মা ঠাকুমার সঙ্গে ছাড়া তাদের বাঙলার ব্যবহারও কমে আসছে। আর মেইন ল্যান্ড বা মূল ভূখন্ড হিসেবে আগে বাঙালিরা কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ কে বুঝতে কিন্তু আজ তারা বোঝেন স্ব স্ব রাজ্যের রাজধানীকে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মধে বাঙলা ভাষী রাজ্য ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের হেড কোয়ার্টার এখনও কলকাতা হলেও; আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়ের ক্ষেত্রে তা অবশ্যম্ভাবী রূপে দিল্লী। দূরত্ব নানা ভাবে নানা করণে দুস্তর হয়ে উঠেছে। এর পেছনে পশ্চিমী চক্রান্ত আছে আর আছে বাঙালিদের মানন্তবাদী মানসিকতা। এ ব্যাপারে তথ্য সন্ধান করে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নামা উচিত বাঙালির। আত্মসমীক্ষার পথে আত্ম-উন্নয়নের পথ-সন্ধান আজ আবশ্যিক।

আন্দামানে ৪০ শতাংশ ও ঝাড়খন্ড রাজ্যে ৪২ শতাংশ আজও বাঙালি জনসংখ্যা। কিন্তু এদুটি রাজ্যের একটি কেন্দ্র শাসিত তাই হিন্দির জুলুম ভয়ানক, অন্যটি বিজে পি শাসিত তাই বাঙালির অধিকার সেখানে থাকবেনা- একথা বেদনার হলেও সত্য। তারা অজুহাত হিসেবে অধিবাসী গজগোষ্ঠার ভাষা সংস্কৃতির প্রশ্ন তুলে বাঙলাকে প্রধান ভাষা করছে না। আর সেই সুযোগে পশ্চিম-উত্তরের বেনিয়ারা তাদের বাণিজ্যের ভাষা হিন্দিকেই চাপিয়ে দিচ্ছে। ভারতে এমন রাজনৈতিক দল নেই যে যারা এ প্রশ্ন সামনে এনে তার মানবিক গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সমাধানের দাবি জানাবে। কেন নেই- কেন বামপন্থীরা এ দাবি জানাবেন না? সারা ভারত ভাষাপ্রশ্নে তাদের পরিস্কার ও ন্যায্য বক্তব্য চায়। তারা কি প্রশ্ন আজও এড়িয়ে থাকতে চান?

সারা ভারত ভাষাপ্রশ্নে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত হওয়া প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষা। উত্তর ভারতে হিন্দি ও উর্দুভাষা। পূর্ব উত্তর ভারতে ইংরেজি ভাষা। রাজধানীসহ অন্যান্য অফিসিয়াল কাজে যতদিন না সংবিধান পরিবর্তন হয় ইংরেজি ও হিন্দিতে সাদারণ কাজ চলুক। কিন্তু লক্ষ্য হোক আঞ্চলিক সমস্ত ভাষায় কাজ করার মতো সত্যিকার অর্থে কেন্দ্রীয় সরকারি পদক্ষেপ।

বিজ্ঞান আজ এত উন্নত যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার অনুবাদ দশ বছরের মধ্যে এত সহজ হবে যে, ছোট টাইপের বদলে উপ টাইপে চেঞ্জ করতে যতটুকু ঝামেলা তাই কেবল কম্পিউটারকে বহন করতে হবে। তার বেশি নয়।

আর আন্দামানে প্রশাসনিক কাজে ও শিক্ষা-দীক্ষায় প্রধানভাষা বাঙলা হওয়া উচিত। আসামের বরাক অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রয়োজন স্বতন্ত্র ভাষা রাজ্য-কোনো রাজ্যের মধ্যে স্বশাসিত জেলার মতো। আর প্রত্যেক রাজ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা বাধ্যতামুলক হওয়া উচিত। সেই রাজ্যের সমস্ত স্তরের মাধ্যমিক স্কুলে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সমূহে ১৮টি মাতৃভাষা পড়ানোর পূর্ণাঙ্গ সুযোগ থাকা প্রয়োজন। নাহলে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রস্তাব ঃ

রাজ্য স্তরের সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ থাকবে বাঙলা মাধ্যমে ১০ শতাংশ থাকবে ইংরেজির জন্য। কোন ইন্টারভিউ বোর্ডে ১ জন অন্য ভাষী সদস্য থাকলে- এ ইন্টারভিউতে আসার আগে থেকে বাঙলা ভাষা বোঝার ক্ষমতা নিয়ে আসতে হবে। এক হাজার পরীক্ষার্থী একজন পরীক্ষকের জন্য হিন্দি বা ইংরেজিতে বলবেন-এটা ভয়ানক অন্যায়।

কিন্তু কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে সামান্য যে কটি চাকরির সুযোগ আজও অবশিষ্ট আছে সেখানেও বাঙলাভাষী ছাত্ররা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এ গণতন্ত্র নয়-এ সব ধরনের এলিটতন্ত্র-যা দ্রুত বর্জনীয়।

রেশনকার্ড করার ফর্ম, ব্যাঙ্কের একাউন্ট সহ অন্যান্য কাজ, পোষ্ট অফিস হাসপাতালে বা থানায় এজাহার প্রদানে সর্বত্র বাঙলার ব্যবহার আবশ্যিক করতে হবে। একাজ আমরা না করতে পারলে- আমরা কাজের ভাষা বাঙলা গড়ে তুলতে পারব না। আইনের ভাষা, বাণিজ্যের ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা, ভ্রমণের ভাষা হিসেবেও চাই বাঙলাকে।

বিভিন্ন অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ স্কুলে আবেদন ফর্ম বাঙলায় হতে হবে। প্রয়োজনে পাশাপাশি আজ ইংরেজিও থাক। পরে আর প্রয়োজন হবে না। একাজ এই ফেব্রুয়ারি থেকে বৈশাখের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শু হোক। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় স্কুলে অফিসে বাঙলা ভাষার আন্দোলন কারিরা একাজে পাহারাদারি শু কন।

উপসংহার ঃ

বাংলা আর বাঙালী নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করলেও এ সমস্যার কথা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু একটি জাতির পুনত্থানের কেবল ভাষার ব্যবহার চাই এ কথা আবেগসর্বস্ব ভাবে উচ্চারণ করার কোন অর্থ হবে না। যদি শিল্পে, বাণিজ্যে, প্রশাসনে, সংগঠনে, প্রযুক্তি ও প্রয়োগে, স্বাস্থ্যে-বিজ্ঞানে, কৃষি ও উৎপাদনে সর্বক্ষেত্রে সে স্বাক্ষর না রাখতে পারে।

তাই এ ভাষাকে মুক্তি দিতে হবে প্রশাসন থেকে জীবনের সার্বিক প্রযোগে। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রগতিশীল রাজনীতি তাও যেন ভাষার বাহনহীনতার জন্য আর অন্য রাজ্যে পৌঁছতে পারছেনা। একথা তো অস্বীকার করা যাবে না।

একুশে ফেব্রুয়ারী কথা বলে আলোচনা শেষ করব - সে'হল এক দিক থেকে দেখলে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন কেবল - ভাষা আন্দোলন ছিল না। আমরা ছাত্র-জীবনে যখন স্কুল থেকে স্কুলে বার্তা নিয়ে গেছি - তখন মনে আছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্র, লোকসংখ্যা, শস্য উৎপাদন, শিল্পায়ন, অর্থবন্টন, পাটের দাম থেকে অর্থ-নৈতিক বৈষম্যের অজস্র চিত্র তুলে ধরতাম। সে দিনের আবেগ ভরা মুখস্থ করা সে কথামালার অর্থ আজ যেন নতুন ব্যাখায় ফিরে আসছে। তাই বামপন্থিরা কেন্দ্র-রাজ্য প্রশ্নে, ভাষাসংস্কৃতি প্রশ্নে, সংহতি ও সংবিধানের প্রশ্নে রাজ্যকে অবহেলা ও রাজ্যের ভাষাকে অপাংক্তেও করার প্রশ্নে যে সব কথা তুলেছেন - তাকে পূর্ণাঙ্গ করে, সবার করে, সব মাতৃভাষার দাবীর সঙ্গে এক করে এক 'সহমর্মি ও প্রতিবাদী' আন্দোলন আজ গড়ে তুলতে হবে। যে আন্দোলন ভারতের ভিতরের ভিত্তি ও সংহতি দৃঢ় করবে-আর আমরা সে দেশ প্রেমের শক্তি নিয়েই লড়ব বাহিরের সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে। পৃথিবীর শত শত মাতৃভাষাকে ও মাতৃ সংস্কৃতিকে যারা শেষ করে দিতে এগিয়ে আসছে। যারা পণ্য বিক্রীর জন্য আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসছে। তাদের প্রতিরোধ করতে - আজ আমাদের মাতৃভাষার শ্বেত পতাকা তুলে ধরতে হবে। প্রথমে নিজেদেরকে ভালোবাসতে হবে - তারপর প্রতিবেশীকে তারপর দেশ ও পৃথিবীকে। আর আমাদের বিশাল স্বপ্ন নিয়ে সমাজ পাল্টানোর ভয়ানক এক যুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

মানবমুক্তিই পারে ভাষার মুক্তি দিতে - সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেখিয়েছে - ভাষার পুষ্টি ও মুক্তি কত দ্রুত হতে পারে। তার সে ভগ্ন স্বপ্ন থেকে আগামী দিনের পূর্ণ স্বপ্ন জাগাতে হবে। আসুন প্রতিটি বাংলাভাষী মানুষেরা গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবিক ঐক্যের এক পবিত্র সরণীতে দাঁড়াই। সংগ্রাম ও সাধনা যেখানে চন্দ্র ও সূর্য্যের মত দৃষ্টি লাবণ্যে উত্তাপে উদ্ভাসিত হবে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com